OPEN ACCESS
IF 8.111

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – i, January 2026, TIRJ/ January 2026/article - 133
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 1114 - 1124
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 1114 - 1124
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

ঔপনিবেশিক আমলে বীরভূম জেলার কৃষি : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান (১৮৫৫-১৯৪৭)

নিখিল বাউরী
Email ID: baurinikhel@gmail.com
iD 0009-0002-7952-3922

Received Date *20. 01. 2026*
Selection Date *10. 02. 2026*

Keyword
Birbhum agriculture, Colonial agrarian system, Permanent Settlement, Pattani system, Mayurakshi irrigation project, Sriniketan agricultural experiments.

Abstract

Recent surge in local history research, particularly through subaltern group contributions, has created widespread interest. National history cannot always illuminate local diversity, which gains completeness through local investigations. On Birbhum agriculture, W.W. Hunter's statistical research, Ranjan Kumar Gupta and Gourihar Mitra's socio-economic analyses, and works by Barun Roy, Mahima Niranjan Chakraborty, Amiya Ghosh, and Parthashankha Majumdar have laid important foundations. This paper goes beyond previous research to analyze agriculture's role in Birbhum's economic progress from new perspectives. Before 1855, Birbhum agriculture faced multiple natural and social crises. Between 1792-1855, at least 13 droughts occurred, leaving vast cultivable lands fallow. District officer reports mention landlord-tenant clashes over water scarcity. Severe droughts pushed rice prices in southern areas to 20 rupees per maund, increasing food grain and cattle theft tendencies. Ajay and Mayurakshi river floods rendered lands barren. The 1826 catastrophic flood depicted ryots' misery: "No trace of even mud huts remained." Zamindars neglected embankment repairs despite responsibilities. Kandar canals silted with sand and clay, crippling irrigation systems. In 1790, the Collector wrote: "Cattle are of the smallest breed, incapable of pulling heavy loads." Permanent Settlement turned urban merchants-traders into zamindars; pattani system created multi-layered rent burdens. 1776 famine reduced population, creating labor shortages. The 19th-century agricultural structure and social formation included the district's natural divisions: western rocky-forested areas, central limited cultivable land, eastern fertile lowlands. Aman rice was the main crop, with aus-boro limited, and rabi crops in Nalhati-Murarui thanas. Pre-colonial emperor chief-agent system transformed into zamindar-intermediary exploitation under colonial rule. 1799-1856 saw zamindari estates fragment into multiple parts with numbers multiplying manifold. New zamindars appointed naibs-gomastas; pattani system increased intermediary oppression. The 1859 Act classified ryots: occupancy (3 rupees 6 annas 3 paise/acre), temporary occupancy (3 rupees 14 annas 1 paisa), non-occupancy (4 rupees 2 paise). Grain-cash rents, nazrana payments, and rent increases upon estate transfers *impoverished ryots. Post-1855 agricultural modernization featured an average of 5 tanks per village; Shankarpur had 111 tanks for 167 acres. Mayurakshi River Project (1951, inaugurated by Bidhan Chandra Roy: 595,000 acres irrigation, 5,000 kW hydropower), Bakreshwar-Kashinala canals, and chhaini-duni implements revolutionized irrigation. Railway expansion increased tribal labor: 1872 (6,954) to 1931 (64,079). Suri Cattle Show and imported foreign bulls (Multani, Hariana) improved livestock. Sriniketan (1921, Elmhirst, Rabindranath Tagore as Chancellor): new crops, hundi sugarcane, crossbred cattle, cooperative banks, and gaantoprottha system made farmers self-reliant. Cooperatives (1904 Act): 1926-27 saw 13,336 societies with ₹32,083,931 capital providing low-interest loans, reducing moneylender exploitation. Birbhum agriculture overcame traditional oppression-natural calamities to advance toward modernization. Sriniketan's rural reconstruction and co-operative movements exemplify unique local initiatives in Bengal's agricultural history, making this essential for understanding Bengal's comprehensive agricultural systems.*

Discussion

ভূমিকা : সাম্প্রতিক সময়ে ‘স্থানীয় ইতিহাস’ ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হিসাবে আগ্রহ বেড়েছে। গত কয়েক দশকে আমাদের দেশে এর উপর বই এবং প্রবন্ধগুলির একটা রচনা সংকলন উঠে এসেছে। এমনকি সাবালটার্ন গোষ্টির ঐতিহাসিকরা স্থানীয় ইতিহাসের সাবধানে তদন্ত করেছেন। জাতীয় ইতিহাস সর্বদা স্থানীয় বৈচিত্র্যের উপর আলোকপাত করতে পারে না। ইতিহাস কোনো প্রতক্ষ্যজ জ্ঞান নয় এবং বিজ্ঞানের মতো ইতিহাস কোন সাধারণ আইন তৈরি করতে পারে না। তাই জাতীয় অনুশীলন অনেক সময় স্থানীয় বৈচিত্র্যকে অস্পষ্ট করে দেয়। যে অঞ্চলটির সম্বন্ধে গবেষণা করা হবে সেই অঞ্চলটির সম্বন্ধে জ্ঞান বিভিন্নভাবে বিবেচনা করে নিতে হবে। ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অনেক কিছুই পরিবর্তন হয়ে থাকে এবং এগুলির সম্পর্কে (স্থানীয় অনুশীলন) জ্ঞান অর্জনের ফলে একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আবির্ভূত হয়। স্থানীয় ইতিহাস এই প্রক্রিয়া পূরণ করতে ব্যাপক সাহায্য করে। অন্য কথায় স্থানীয় ইতিহাস সাবধানে তদন্ত ও বিশ্লেষণ করে দীর্ঘ ইতিহাস গঠন করে। (দত্ত ১)।

বীরভূম জেলার কৃষিকাজ নিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক তদন্তের প্রথম প্রচেষ্টা নয়। যে সমস্ত পণ্ডিতদের বীরভূম জেলার কৃষিকাজ নিয়ে শ্রমসাদ্য গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি হল ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের বীরভূম জেলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলির পরিসংখ্যান সংক্রান্ত গবেষণা, রঞ্জন কুমার গুপ্তের জেলার সমাজ ও অর্থনৈতিক বিষয়ে গবেষণা, গৌরিহর মিত্রের গ্রামীন জনজীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা নিয়ে অনুসন্ধান। এছাড়াও বরুণ রায়, মহিমা নিরঞ্জন চক্রবর্তী, অমিয় ঘোষ ও পার্থশঙ্খ মজুমদারের নাম বীরভূম জেলার গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত কাজগুলি বীরভূমের কৃষিকাজের গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দিয়েছে এবং এই অঞ্চলে আরও গবেষণা করার আগ্রহ তৈরি করেছে। তবে উল্লিখিত পণ্ডিতগণ কৃষিকাজের যেসমস্ত দিক আলোচনা করেছেন তার বাইরে এই প্রবন্ধে কয়েকটি নতুন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধটির মধ্যদিয়ে বীরভূম জেলার অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে কৃষিকাজের কি কোনো ভূমিকা ছিল? সেই ইতিহাস পরিপূরক দৃষ্টিভঙ্গি করে তোলার এক বিনীত প্রয়াস করা হয়েছে, তাছাড়া সঠিক তদন্ত ও বিশ্লেষণ করে যেমন স্থানীয় ইতিহাসের দ্বারা দীর্ঘ ইতিহাস গঠন করা যায় তেমনই আমার এই প্রবন্ধটি বাংলার সামগ্রিক কৃষিব্যবস্থার ইতিহাসকে অনুধাবন করতে উপযোগী হয়ে উঠবে।

সাধারণভাবে একটি দেশের কৃষি উন্নতির মাপকাঠি হল - (১) চাষযোগ্য জমির পরিমাণ (২) উৎপন্ন ফসলের প্রকৃতি (৩) গবাদি পশুর সংখ্যা (গ্যাডগিল ২)। উনিশ শতকে বাংলায় কৃষির পরিসংখ্যানের অভাব থাকায় সঠিক হিসেব দেওয়া কঠিন, তবে ১৮৯৭-৯৮ সাল থেকে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়। এই সময়ে চাষের জমি বেড়েছে, ফসলের প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং রাস্তাঘাট উন্নতির ফলে খাদ্য ও বাণিজ্যিক পণ্যের সঞ্চালন সহজ হয়েছে। সরকারি ও

বেসরকারি উদ্যোগে সেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং উন্নত গবাদি পশু উৎপাদনের দিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। একই জমিতে বার্ষিক একাধিক ফসল চাষ এবং সারবিহীন চাষাবাদ কমে উন্নত পদ্ধতি দেখা গেছে। (গ্যাডগিল ৬৬-৬৭)। বীরভূম জেলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এটি তিন ভাগে বিভক্ত - পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব। পশ্চিম অংশ অধিকাংশ পাথুরে, জঙ্গল-বেষ্টিত এবং কাঠিন্যপূর্ণ, যার কারণে কৃষি প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। মধ্য অংশের কিছুটা এলাকায় চাষ সম্ভব হলেও পূর্বাংশের নিচু ও উর্বর মাটি কৃষির জন্য সবচেয়ে উপযোগী। জেলার প্রধান ফসল হল আমন বা শীতকালীন ধান, যা অধিকাংশ জমিতে চাষ হয়। আউশ ধান ও বোরো ধানের পরিমাণ কম, এবং রবি ফসল সীমিত এলাকার মধ্যে চাষ হয়ে থাকে, প্রধানত নলহাটি ও মুরারুই থানায় (কুমার গুপ্ত ৯-১১)।

১.১. ১৮৫৫ সালের পূর্ববর্তী কৃষি ব্যবস্থা : ১৮৫৫ সালের আগের বীরভূমে কৃষির পথে নানা ধরনের সমস্যা ছিল। বৃষ্টি নিয়মিত না হওয়ায় অনেক সময় বন্যা ও খরার দাপট দেখা যেত। জেলাশাসকের পত্রানুযায়ী পর্যাপ্ত জল সরবরাহ না থাকায় জমিদার ও রায়তরা মাঠে জলের জন্য মারামারি করে (কুমার গুপ্ত ১১৪)। ১৭৯২ থেকে ১৮৫৫ সালের মধ্যে জেলাটিতে অন্তত ১৩ বার খরা পড়েছিল, যার ফলে প্রচুর চাষের জমি পতিত থাকত। নিদারুণ খরার জন্য জেলার দক্ষিণাংশে চালের দর উঠেছিল টাকায় ২০ সের আর তার প্রভাবে জেলায় খাদ্যশস্য ও গরু চুরির ধুম পড়ে গিয়েছিল (গুপ্ত ১৬৩-১৬৪)। বর্ষায় অজয় এবং ময়ূরাক্ষী নদীর বন্যায় জমিগুলো বালি ভরে অকেজো হয়ে পড়ত। ১৮২৬ সালের বন্যা সম্পর্কে জেলাশাসক জানান 'কোন কুঁড়ে ঘরের চিহ্ন ছিল না, সর্বনাশা বন্যা রায়তদের যে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলেছিল তা বলার নয় (গুপ্ত ১৬৪)। বাঁধ নির্মাণ ও সংস্কারের দায়িত্ব ছিল জমিদারদের, যা তারা প্রায়ই পালন করত না। এখানে সরকারের কোনো দায়িত্ব ছিল না। তবে যেসব অঞ্চলে কোম্পানির উৎপাদন কেন্দ্র ছিল সেখানে কোম্পানি স্ব-আগ্রহে পুরনো বাঁধ সংস্কার ও নতুন বাঁধ নির্মাণে ব্যয় করত (কুমার গুপ্ত ১১৬)।

সেচের কাজে ব্যবহৃত খাল, যেগুলো কাঁদর নামে পরিচিত ছিল, সেগুলো পলি ও বালিতে ভর্তি হয়ে যাওয়ার কারণে যথাযথ সেচ ব্যবস্থা কষ্টকর ছিল। যদিও খাল খননের প্রয়োজন ছিল কিন্তু রাজনীতির অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে সেগুলো ঠিক মতো হত না (উইলিয়াম ৭-৮)। গবাদি পশুর অভাব এবং পশুদের রোগবালাই ও চিকিৎসার অভাব কৃষি কাজে বাধা সৃষ্টি করত। ১৭৯০ সালে কালেক্টর লেখেন 'জেলায় গবাদি পশু ক্ষুদ্রতম জাতের, ভারী বোঝা টানতে বা বেশি পরিশ্রম করতে অক্ষম' (গুপ্ত ১৭২)। গবাদি পশু থেকে প্রাপ্ত গোবরই তখন মূল সার হিসেবে ব্যবহার হত, কিন্তু রোগে অনেক গবাদি পশু মারা যাওয়ার কারণে সার প্রস্তুতেও ঘাটতি ছিল। গো-সম্পদ রক্ষার জন্য যথেষ্ট চিকিৎসক ও চিকিৎসা ব্যবস্থা জেলায় ছিল না (মুখোপাধ্যায় ১৪)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নতুন ধরণের জমিদার শ্রেণী বৃদ্ধি পায়, যারা আসলেই ছিল শহরের ধনী ও ব্যবসায়ী। অবশ্য অধ্যাপক বিনয় চৌধরী বলেন 'এজেন্সি হাউসগুলির পতনের ফলে দালালি ও ফাটকা পুঁজি জমি ক্রয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল' (চৌধুরী ১১৫)। এসব জমিদার, কৃষকদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋণ নিতো এবং বিভিন্ন ধরনের খাজনা আরোপ করত, যা কৃষকদের আর্থিক সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে দিতো (গুপ্ত ১৪৬)।

বীরভূমে জনসংখ্যার অভাবও বড় সমস্যা ছিল, কারণ ১৭৭৬ সালের মন্বন্তরের ফলে দীর্ঘদিন জনসংখ্যা কম ছিল। ফলে শ্রমিকের অভাবে কৃষি কাজ বাধাগ্রস্থ হত। শ্রমিক ঘাটতির কারণে বাইরের জেলা থেকে নিয়ে আসা হত অনাবাসী রায়ত ও আদিবাসীদের। তা সত্ত্বেও কৃষিকাজে শ্রমজীবীর অভাব থেকেই গিয়েছিল (কুমার গুপ্ত ১২৩-১২৪)। পত্তনী ব্যবস্থা নামে জমিদারির অংশ ভাগ করা হয়ে মধ্যস্বত্বভোগীদের বহুতল সৃষ্টি হয়। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের ওপর অসহনীয় আর্থিক চাপ সৃষ্টি হয়, কারণ একের অধিক স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের খাজনা চাপাতো (দত্ত ৪৬)। এই সব কারণেই ১৮৫৫ সালের পূর্বে বীরভূমের কৃষি ব্যবস্থা ছিল সংকটপূর্ণ এবং বিকাশে অনেক বাধার মুখোমুখি।

১.২. উনিশ শতকের কৃষি কাঠামো : প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষি কাঠামো একটি অনন্য পদ্ধতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল, যেখানে শীর্ষে ছিলেন সম্রাট। তিনি নিয়মিত বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য স্থানীয় প্রধানদের নিয়োগ দিতেন, যারা

সরকার ও কৃষকের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করত। এই এজেন্টরা ধীরে ধীরে জমির ওপর তাদের বংশানুক্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিল এবং কেউ কেউ কৃষকদের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করত। তবে উপনিবেশিক শাসনের সময় এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছিল (দত্ত ৪০)। বীরভূমের কৃষি সমাজ বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠী এবং নিম্নবর্ণীয় হিন্দু ও মুসলমানের মিশ্রণে গঠিত ছিল। উপজাতি গোষ্ঠীগুলো তখনও পর্যন্ত জেলার সাধারণ জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত ছিল না এবং পশ্চিমাঞ্চলের বনাঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করত। সংস্কৃতি ও আর্থিক দিক থেকে তাঁরা পশ্চাদপদ ছিলেন। জেলার বাকি অংশের আবাদী জমি খুবই সীমিত এবং অধিকাংশ সম্পদ অভিজাত মুসলমান ও উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের দখলে ছিল, যারা সমাজের শীর্ষ স্থানাধিকারী হিসেবে গ্রাম্য মন্ডল বা মোড়লের ভূমিকায় ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে বীরভূমের সাধারণ কৃষকের জীবনে দুই স্তরের শোষক প্রাধান্য বিস্তার করত। একটি স্তরে ছিল সরকার ও জমিদার, অন্য স্তরে ছিলেন মুখ্যরায়ত বা মন্ডল ও মহাজন। সরকার জমিদারের ওপর ক্রমাগত সদর খাজনা বাড়ানোর ফলে জমিদারেরও কৃষকের ওপর চাপ বাড়ানো বাধ্যতামূলক হয়ে উঠেছিল। বকেয়া সদর খাজনা আদায়ের কঠিন পরিস্থিতি দেখা দিলে, জমিদারি একক থেকেও বহু খন্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৭৯৯ থেকে ১৮৫৬ সালের মধ্যে জমিদারের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে একক জমিদারি বহু ভাগে বিভক্ত হয়। ফলে জমিদারের সংখ্যা বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। নতুন জমিদাররা জমিদারি ব্যবস্থার উন্নত ও দক্ষ পরিচালনার জন্য বিশ্বস্ত নায়েব-গোমস্তা এবং ম্যানেজার নিয়োগ করত। তাঁরা অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর চেষ্টা করত এবং কখনো কখনো প্রভাবশালী রায়তদের কাছে জমিদারি ইজারা দিয়ে তাদের শোষণ বাড়াত। পত্তনী ব্যবস্থা চালু হয় খাজনা আদায় সহজ করার জন্য, যা একটি স্তর থেকে নিচু পর্যায়ে বৃহৎ সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীর সৃষ্টি করেছিল। এতে সাধারণ কৃষকের উপর খাজনার বোঝা বৃদ্ধি পায়। এই পত্তনী ব্যবস্থা বাতিল করা হয়নি কারণ এটা জমিদার ও সরকারের জন্য উপকারী ছিল (গুপ্ত ১১৩)।

১.৩. ১৮৫৫ সালের পরবর্তী কৃষি ব্যবস্থা : বীরভূম জেলার কৃষি ব্যবস্থার মূল বাধা ছিল খরা; এই সমস্যার সমাধানে পুকুর ও জলাশয় খনন এবং পুরনো জলাশয় সংস্কার করা হয়, যা সেচ ও জল সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়েছিল। ধর্মীয়-সামাজিক মুল্যবোধেও পুকুর নির্মাণকে পুণ্যকর্ম বলে গুরুত্ব দেওয়া হত (বাগ্চী ও মুখোপাধ্যায় ২২০)। প্রতিটি গ্রামে গড়ে পাঁচটি করে জলাশয় ছিল। শুধুমাত্র শংকরপুর গ্রামে ১৬৭ একর জমির জন্য ১১১টি জলাশয় ছিল (ও ম্যালি ৫৪)। জেলার অধিকাংশ জমি ছিল জঙ্গলে পূর্ণ, স্থানীয়রা এই জমি পরিষ্কারকে পাপ ভাবতেন। ভূস্বামীরা পশ্চিমের জেলাগুলি থেকে আদিবাসীদের নিয়ে এসে প্রথমে অস্থায়ী পরে স্থায়ী বাসিন্দা করেন, যে কারণে জেলার কৃষি শ্রমশক্তি বাড়ে এবং নতুন জনসংযোগের সুযোগ তৈরি হয় (গুপ্ত ১৬৯)।

রেলপথ নির্মাণের ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের শ্রমিকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ে। ১৮৭২ সালের লোক গণনা অনুযায়ী আদিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৬ হাজার ৯৫৪ জন। ১৯৩১ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল ৬৪,০৭৯ জন (মুখার্জী ১৯৩২)। শুধু আদিবাসী নয়, রেলপথ বিস্তারের পর কাজের সুযোগ সন্ধানের জন্য কোড়া, বাগ্দী প্রভৃতি জাতির মানুষের আগমন লক্ষ্য করা যায়। কালীমোহন ঘোষের সমীক্ষায় দেখা যায় বোলপুর অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী হওয়ায় খুব সম্ভবত অপেক্ষাকৃত গরীব নিম্নবর্ণের পরিবার জনসংখ্যার বিচারে কম ক্ষতিগ্রস্থ। অন্যদিকে বীরভূমের অন্যান্য অঞ্চলে নিম্নবর্ণের লোকেরা ততটা মহামারীতে প্রভাবিত হননি। ফলে সামগ্রিক বিচারে ও নিম্নবর্ণের জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অপেক্ষাকৃত ভাবে বেড়েছে (মিত্র xvi)। ফলে কৃষিকাজের শ্রমের ঘাটতি পূরণ হয় এবং আবাদি জমি পুনরুদ্ধার সহজ হয়। কৃষিকাজে শক্তিশালী গবাদিপশুর ঘাটতি পূরণের জন্য বর্তমানে জেলা সদর সিউড়িতে “সিউড়ি ক্যাটেল অ্যান্ড প্রোডাক্ট শো” স্থাপন করে পশু প্রদর্শনী, বিদেশি ষাঁড় আমদানি ও পশু চিকিৎসালয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়। চাষে ব্যবহারযোগ্য বলদ সরবরাহ এবং গোবর সার সংরক্ষণের ফলে জমির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় (ও ম্যালি ৬৫)।

জেলায় কৃষিকাজের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের সমবায় সমিতি গড়ে ওঠে। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক ও সেচ সমবায়— যার মাধ্যমে কৃষকদের ঋণপ্রদান করা হয়, যার ফলে মহাজনী ঋণের পরিমাণ কমে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ‘সমবায়’ নীতির প্রচার ঘটে, যা কৃষক সমাজের আর্থিক ও সামাজিক পুনর্গঠনে সহায়ক হয় (মিত্র ৪৩৬)। শ্রীনিকেতনে কৃষির উদ্যোগে নতুন জাতের ফসল, আখ চাষের হাঁড়ি পদ্ধতি, আলু, শাকসবজি এবং মিশ্রজাত গরু (মুলতানি,

হরিয়ানা, লাল সিন্দি) আমদানির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন ও বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পায়। এতে কৃষক-সমাজের আর্থিক অবস্থায় উন্নতি আসে (মিত্র ৪২৭-৪২৮)। কম জমির মালিক গ্রামবাসীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে শ্রম বিনিময় করত যার নাম ছিল 'গাঁতোপ্রথা'। জরুরি প্রয়োজনে শুধু খাবার দিয়ে শ্রম দেওয়া বা নেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল, যার ফলে কৃষি কাজের সামাজিক ঐক্য ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় (মিত্র ৪৩৬)।

১.৪. সেচ ব্যবস্থা : কৃষি প্রধান দেশে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম, যা প্রাচীন ভারতে সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও মূল্যায়িত হত। কূপ ও পুষ্করিণী খনন করে সেচের মাধ্যমে শুধু কৃষিকে সমৃদ্ধ করার জন্য নয়, ধর্মানুষ্ঠানের অংশ হিসেবেও বিবেচিত হত। তবে ব্রিটিশ আমলে ভারতে সেচ ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পিত কোনো প্রচেষ্টা ছিল না, যা সেচের প্রতি অবহেলার পরিচায়ক ছিল; উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩৪-৩৫ সালে রেলওয়ে খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছিল, তার তুলনায় সেচ ব্যবস্থার জন্য খুব কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল (বাগ্চী ও মুখোপাধ্যায় ২২০-২২১)। ভারতবর্ষের কৃষিতে সেচ ব্যবস্থার প্রধান তিন ধরনের পদ্ধতি ছিল কূপ খনন, খালকেটে এবং বৃহৎ জলাশয়ের সাহায্যে বীরভূমে সেচ ব্যবস্থা মূলত খালকেটে ও জলাশয় ব্যবহার হত। খালকেটে সেচ আবার নিত্যবহ খাল ও প্লাবন খাল হিসেবে বিভক্ত ছিল। বক্কেশ্বর ও কাশীনালা সেচ খাল বীরভূমের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, যদিও স্বাধীনতার পর সেগুলি কার্যকর থাকেনি। এই সেচ খালগুলো খারিফ ও রবি দুই মৌসুমের ফসল চাষে ব্যবহৃত হত (চক্রবর্তী ও মজুমদার ৩১, ১৯২)।

বীরভূম জেলার মাটি তাপমাত্রা ও জলধারণ ক্ষমতার দিক থেকে সেচের জন্য কম উপযোগী। অতীতে বৃষ্টিপাতের অভাবে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকায় চাষীরা উদ্বিগ্ন থাকতেন। ময়ূরাক্ষী নদী প্রকল্পের বাস্তবায়নের আগে জলাশয়গুলো সেচের জন্য ব্যবহৃত হত এবং বর্ষায় সেগুলোর মেরামত হত। স্বাধীনতার আগে অনেক বড় বড় জলাশয় ও ছোট জলাশয় ছিল, যা সেচের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল (মজুমদার ১৯১)। জলাশয় থেকে সেচ প্রদানের জন্য ছেনি ও দুনি নামে দুই ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হত, যা সেচের পুরাতন ও সহজ উপায় ছিল। ছেনি বা সেচনি যন্ত্র হল এমন একটি সহজ হাতিয়ার, যা দুজন ব্যক্তি পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জল তোলার কাজ করে। দুনি বা দোন যন্ত্রটি একক হিসেবে ব্যবহৃত হত, কিছুটা বৃহত্তর এবং এক ব্যক্তির মাধ্যমে সেচ কাজ সম্পাদন হত। দুনি কৌশল খরচে কম এবং ছোট ফসলি জমির জন্য উপযোগী ছিল। এই সরঞ্জামগুলো সাধারণত বাঁশ থেকে তৈরি হত এবং কোন বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হত না (হান্টার ৩৭০)। ময়ূরাক্ষী নদী প্রকল্পের মাধ্যমে দুটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল, একটি বিহারের সাঁওতাল পরগনার মেসেঞ্জার এলাকায় এবং অন্যটি বীরভূম জেলার তিলপাড়া এলাকায়। এই প্রকল্প থেকে ৫৯৫,০০০ একর জমি সেচে উপকৃত হয় এবং ৫০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ১৯৫১ সালে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধান চন্দ্র রায় কর্তৃক এটি উদ্বোধন করা হয় (চক্রবর্তী ৬৪)। ময়ূরাক্ষী প্রকল্পের সঙ্গে অন্য সেচ প্রকল্প যেমন নদী উত্তোলন, নলকূপ, জলাশয় প্রকল্প রয়েছে। তবে ময়ূরাক্ষী এলাকার জন্য তারা জল সরবরাহ করত না। এই প্রকল্পটি বীরভূম জেলার সেচ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটায় (মিত্র ১৭)।

সারণী **১.১: ১৯৩৫-৩৯ সালে জেলায় নির্মিত সেচ প্রকল্পের আর্থিক ফলাফল**

সাল	মোট প্রাপ্ত টাকা	সরাসরি ও পরোক্ষভাবে মোট খরচ
১৯৩৫-৩৬	১৫,৫৩৮	১২,৪১৬
১৯৩৬-৩৭	১৮,৮১০	১৩,৭৫৩
১৯৩৭-৩৮	১২,৬০১	১৫,৮৪০
১৯৩৮-৩৯	১৩,১০৯	১১,৬৬১
১৯৩৯-৪০	১৪,৮৪১	১৩,০৮৪

উৎস: অশোক মিত্র, সেনসাস রির্পোট ১৯৫১, বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯৫৪, পৃ. Xxxvi

সারণী ১.২: ১৯৪৮-৫৪ সালে জেলায় সম্পন্ন সেচ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	মোট খরচ	উপকৃত এলাকা (একর)		অতিরিক্ত বার্ষিক উৎপাদন		সমাপ্তির বছর
		খারিফ শস্য	রবি শস্য	খারিফ শস্য	রবি শস্য	
সাখেরা বাঁধ	৪,৫৫২	৬৭	১৭	৭	৯	১৯৪৮-৪৯
ধানুথা পাতিলা বাঁধ	৪৯,৭৮৪	১০০০	২৫০	১১১	১২৬	১৯৪৮-৪৯
ঝিনাইপুর বাঁধ	১২,২৩১	১১৭	৩০	১৫	১৫	১৯৪৮-৪৯
হিংলা বাঁধ	১৬২,২৯৮	২০০০	৫০০	১৮৫	২৫০	১৯৪৯-৫০
বেলগ্রাম বাঁধ	২৫,৭৫৫	৩৫০	৮৮	১৭৫	৪৪	১৯৫০-৫১
নগরী রাজার বাঁধ	২০,১১৩	২৪০	৬০	২৭	৩০	১৯৫০-৫১
সোনারা বাঁধ জলনির্গমন	৩৩,৪৫২	৬৫০	১৬২	৭২	৮১	১৯৫১-৫২
মারকালা বিল জলনির্গমন	১০,২৬৯	২৫০	৬৩	২৩	৩১	১৯৫১-৫২
বাহাদুরপুর জলনির্গমন	৯,৪৪২	১২৫	৩১	৬২	১৬	১৯৫৩-৫৪

উৎস: অশোক মিত্র, সেনসাস রিপোর্ট ১৯৫১, বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯৫৪, পৃ. xxxvii

১.৫. রায়ত ও খাজনা : ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় কৃষি সমাজ ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণা গ্রাম্য পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করেছিল, যারা তালুকদার, জমিদার, জায়গীদার নামে পরিচিত যা ভারতের নিজস্ব নয়, বরং সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি। জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত খাজনা নেওয়ার মাধ্যমে শোষণ চালাতো, ভূমি পণ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত হওয়ায় জমিদারের লোভ বৃদ্ধি পায় (বাগচী ও মুখোপাধ্যায় ১)। ১৭৯৩ সালের কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদারদের নির্ধারিত রাজস্ব আদায়ের আইন ছিল, কিন্তু বাস্তবে ঘটেনি। জেমস মিল বলেন - "জমিদাররা কৃষকদের অধিক খাজনা আদায় করে নিজের লাভ বাড়াত (মুখোপাধ্যায় ৫৩-৫৫)। লর্ড ময়রা কৃষকের দুর্দশা কিছুটা বুঝলেও কৃষক রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না। জমিদার ও কৃষকের মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি কালেক্টরের মাধ্যমে হলেও বাস্তবিক সুরক্ষা ছিল সীমিত (মুখোপাধ্যায় ৫৫)।

১৮৫৯ সালের আইনে জমিদারের 'পাট্টা' ও রায়তের কবুলিয়ত দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় (চৌধুরী ৬)। কৃষকদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয় স্থায়ী, দখলি ও অদখলি রায়ত। স্থায়ী রায়তদের খাজনা বৃদ্ধিতে বিধিনিষেধ ছিল, তবে দখলি ও অদখলিদারির ক্ষেত্রে খাজনা বৃদ্ধি শর্তাধীন বা চুক্তি ভিত্তিক ছিল। কিছু আইনি সংস্কার হলেও ভাগচাষী ও অধীনস্থ কৃষকদের রক্ষা যথেষ্ট ছিল না। কৃষকরা জমি বিক্রি ও হস্তান্তর করার সুযোগ পায়, তবে তাদের অধিকার অসম্পূর্ণ ছিল (সাহা ৯৭-৯৮)। কৃষকদের জন্য জমিদারদার ও মহাজনের শোষণ খুব বড় সমস্যা ছিল। ঋণের ভারে কৃষক দারিদ্র্য ও দাসত্বের কবলে পড়েছিল। ঋণের কারণে কৃষকের জীবনযাত্রা ও কর্মক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে হতাশা সৃষ্টি হত। স্যার

হ্যামিলটনের ভাষায় 'দেশ আজ মহাজনের কবলে। কৃষি আজ ঋণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ। কৃষকের এই অবস্থা অস্বীকার করার উপায় নেই। এটি জ্বলন্ত সত্য'। (সান্যাল ৪৯)

জমিদারিগুলোর বিভাজনের ফলে অনেক জমিদারি স্তর সৃষ্টি হয়, যারা কৃষকদের থেকে খাজনা, নজরানা, এবং কর আদায় করত, যা কৃষকের আর্থিক চাপ বাড়িয়ে তোলে। বীরভূমে অন্যান্য জেলার তুলনায় রাজস্বের হার বেশি ছিল। অনুপস্থিত জমিদারদের জায়গায় মধ্যস্বত্বভোগীরা জমির পরিচালক হিসেবে অধিকার দখল করত, যা কৃষকের জন্য আরও শোষণ সৃষ্টি করত (মুখার্জী ১১৯)। রায়তদের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী স্থায়ী রায়তদের থেকে তুলনামূলক কম খাজনা আদায় হত; দখলদারি এবং অদখলদারি রায়তরা যথাক্রমে বেশি খাজনা পরিশোধ করত। পার্থ চ্যাটার্জীর বেঙ্গল ১৯২০-১৯৪৭: দ্য ল্যান্ড কোয়েশ্চেন, গ্রন্থের প্রথম খন্ড থেকে এই খাজনা বিভাজনের স্বরুপটি স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি দেখিয়েছেন প্রতি একরে স্থায়ী রায়তের গড় খাজনা ছিল ৩ টাকা ৬ আনা ৩ পয়সা, দখলদারি রায়তরা দিত ৩ টাকা ১৪ আনা ১ পয়সা এবং অদখলদারি রায়তরা দিত ৪ টাকা ২ পয়সা (চ্যাটার্জী ১৯)। যখন ফসলের দাম বাড়তে থাকে তখন উৎপন্ন ফসল থেকে খাজনা নেওয়া লাভজনক হয়। আবার ফসলের দাম কমে গেলে টাকায় খাজনা নেওয়া সুবিধাজনক হয়। ১৯শ শতকে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধির ফলে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের জন্য শস্যে খাজনা আদায় লাভজনক হয়ে ওঠে। এছাড়াও বিভিন্ন পন্থায় খাজনা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হত। জমিদার পরিবর্তন হলে কৃষকের খাজনা বেড়ে যেত। কৃষক আইনের প্রতি অজ্ঞ হওয়ায় মধ্যস্বত্বভোগীরা কৃষককে আইনের ফাঁকফোকর দেখিয়ে অতিরিক্ত জায়গা দেখিয়ে অধিক খাজনা আদায় করত (মুখোপাধ্যায় ২৩)।

১.৬. গবাদি পশুপালন : কৃষি প্রধান দেশে জমি ও গৃহপালিত পশু কৃষকের মূলধন হলেও অনেক জায়গায় রাজনীতি, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার কারণে জমিতে কৃষকের স্থায়ী মালিকানা ছিল না। এর ফলে কৃষকের মধ্যে জমির প্রতি আগ্রহ হ্রাস পায় এবং পশুপালনের প্রতি অনীহাও দেখা দেয়। বসন্ত রোগের কারণে বহু গরুর মৃত্যু দেশে শোচনীয় অবস্থা তৈরি করেছে, যা কৃষক ও দেশের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ (স্বর্ণকার)। বীরভূম জেলার কোনো স্থানে গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনের জন্য একচেটিয়া জমি নেই। অধিকাংশ গ্রামবাসী দরিদ্র, তাই উচ্চমূল্যের গবাদিপশুর খাদ্য কিনতে পারে না। অধিকাংশ কৃষক খাদ্য ও নগদ ফসল চাষে মনোযোগী এবং পশুপালনের জন্য জমির বরাদ্দ দিতে অনীহা প্রকাশ করে (মুখোপাধ্যায় ও মজুমদার ৩০২, ২১৫)। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে কৃষি উন্নতি সম্ভব এবং পশুপালন সুস্থ রাখা যায়, এটিই ছিল তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেটদের মৌলিক লক্ষ্য। ১৮৯৭ সালে সিউড়িতে পশু ও কৃষিজাত প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়, যেখানে বিভিন্ন পশু ও কৃষিজাত দ্রব্য প্রদর্শিত হয় (মুখোপাধ্যায় ৩০২)। পশুপালনের উন্নতির জন্য চারণ ক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট সংস্থান এবং পুষ্টিকর ফসলের আবাদ জরুরি বলে ধারণা করা হয় (স্বর্ণকার ৫৯)।

পশুপালনের উন্নয়নে সরকারিভাবে বিভিন্ন কল্যাণমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। খরিফ ও রবিশস্য মরসুমে গবাদি পশুর খাদ্যের উন্নত বীজ ভর্তুকি মূল্যে বিতরণ করা হয় এবং পশু খাদ্য উৎপাদনের জন্য বড় বড় ক্ষেত্র গড়ে তোলা হয়। ইউরোপীয় দেশের বৃষ থেকে দেশীয় গাভীর গোবৎস উৎপাদন করার ফলে স্বাস্থ্যবান ও বলবান বলদ পাওয়া গিয়েছিল (মজুমদার ২১৫)। গোশালা নির্মাণে ও গোশালাগুলির স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় (স্বর্ণকার ৩১)। গবাদি পশুর চিকিৎসার জন্য পশু চিকিৎসক ছাড়াও ঔষধের দোকান থাকা আবশ্যক, যাতে অসুস্থ পশুর দ্রুত সেবা দেওয়া যায়। প্রজনন ষাঁড় সংরক্ষণ করাও জরুরি, যা পশুপালনের প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। সঠিক পরিষেবা ও উৎসর্গহীনতার অভাবে এই উদ্যোগগুলো তেমন সাফল্য লাভ করতে পারেনি (লাহিড়ী ১৬৬-১৬৭)। গো জাতির সংরক্ষণে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ভাবনারও প্রভাব ছিল। গো-জাতি'কে দেবতার মতো সম্মান জানানো হয় এবং গো-জাতি বিধ্বংস এড়ানোর জন্য ধর্মীয় বিধি নিষেধ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এটি গো-জাতির প্রতি মানব সমাজের ভাবনা ও আচরণের উৎস হিসেবে কাজ করে এবং গো সংরক্ষণে উৎসাহ প্রদান করে (স্বর্ণকার ৬৭)।

১.৭. শান্তিনিকেতন কৃষি বিভাগ : পল্লী সংগঠন এবং সমবায় সমিতি কৃষকদের দুরবস্থা দূর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯০৪ সালে কেন্দ্রীয় পরিষদ সমবায় ঋণ বিষয়ে আইন প্রণয়ণ করে এবং ১৯১৯ সালের পর এটি প্রাদেশিক

বিষয় হিসেবে স্বীকৃত হয়। সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদের স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া, উদ্বৃত্ত আয় সঞ্চয় করা ও জমি বন্ধকী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার ফলে কৃষকের আর্থিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর নেতৃত্বে শ্রীনিকেতন ও স্যার হ্যামিল্টন মহোদয়ের সুন্দরবন গোসাবা অঞ্চলে পল্লী-উন্নয়ন কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। (ভট্টাচার্য ৩১৫)। ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে লেওনার্ড এলমহার্স্ট কর্তৃক শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয়, যার শুরুতে নাম ছিল ‘ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার’। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চ্যান্সেলর ও কোষাধ্যক্ষ এবং এলমহার্স্ট ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এখানে পল্লী সংগঠন বিভাগ, সমাজ-শিক্ষা, গ্রামীণ উচ্চশিক্ষা ইত্যাদি নতুন বিভাগ গড়ে ওঠে। ১০ জন ছাত্র ও কর্মীর সহায়তায় ১৯২২ সালের শুরুতে প্রকৃত কাজ শুরু হয়, যা গ্রামীন জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। (সিংহ ৪২৪-৪৩২)

শ্রীনিকেতনের কাজের ব্যাপ্তি বিস্তৃত ছিল; কাজের মধ্যে ছিল পক্ষী ও মৌমাছি পালন, গোপালন, বাগান, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, সমবায়, ধাতুর কাজ ইত্যাদি। ১৯২৩ সালে গ্রামের নানা উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেয়া হয়, যেমন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বীজ ও সার তৈরি, মুরগি পালন, শাকসবজি চাষ, মাছ চাষ, তাঁত, বাঁশ-বেতের কাজ, মহিলাদের সেলাই শেখানো এবং স্বাস্থ্য সমিতি গঠন। একে একে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামকর্মী নিযুক্ত করে উন্নত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, পল্লী সংগঠন এবং সমবায় আন্দোলন কৃষকদের স্বাবলম্বী করে তুলতে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে খুবই কার্যকর ছিল। ব্যাপক শিক্ষাদান, সংগঠন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়নে অন্তর্ভুক্ত ছিল। (সিংহ ৪২৭)

১.৮ **কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি :** কৃষকদের আর্থিক দুরবস্থাই ভারতের কৃষিকার্যের অবনতির মূল কারণ। কৃষকগণ উচ্চ সুদে মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে আজীবন ঋণভারে বাধ্য থাকেন। ১৯৩১ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটি পল্লী ঋণের পরিমাণ প্রায় ৯০০ কোটি টাকা হিসেবে অনুমান করেছিল। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ঋণদাতাদের জন্য সুদের সর্বোচ্চ হার নির্দিষ্ট করে এবং জমি হস্তান্তর থেকে কৃষককে রক্ষা করার জন্য ভূমি-হস্তান্তর আইন পাশ করে। মহাজনদের অত্যাচার রোধে মহাজনী আইন প্রণয়ন করা হয় এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য গ্রাম্য সমবায় সমিতি এবং ব্যাঙ্কের উদ্যোগ নেওয়া হয়। (ভট্টাচার্য ৩১৪)

১৯০৪ সালে প্রথম সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ হয়, যা বাংলায় কৃষি ঋণ সমিতির প্রতিষ্ঠার সূচনা করে। ১৯২৬-২৭ সালে কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল ১৩,৩৬৬ এবং সদস্য ৩২৮,৪৩৮। এই সমিতির মূলধন ছিল প্রায় ৩২, ০৮৩,৯৩১ টাকা, (অ্যানুয়াল রিপোর্ট ৫২-৫৩) যা সমিতির সদস্যদের দ্বারা এবং জেলার গ্রামগুলোর সমিতি থেকে মূলধন খাটানো হত। সরকারও এই সমিতিগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ দিত। ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা সহজ ছিল এবং জমিদারের খাজনা বা সরকারের রাজস্ব মেটানোর পর এই ঋণ আদায় করা হত (স্বর্ণকার ১৮৫)। সাঁওতালদের অর্থনৈতিক লেনদেন প্রধাণত শস্যের মাধ্যমে হয়। তারা খাজনা দেওয়ার জন্য ধান বিক্রি করে ঋণ গ্রহন করে। ১৯০৯ সালে ধানের দাম ছিল টাকায় ২৩ সের, সাঁওতালরা টাকায় ২২ সের মূল্যে বিক্রি করত এবং আয়ের অংশ দিয়ে মদ কিনত। তাদের অর্থের ধারনা সীমিত, তাই যখন ঋণ নগদ অর্থে রূপান্তরিত হয় তখন শোধ করার সম্ভাবনা কম থাকে। শস্য-ভিত্তিক কৃষি ব্যাংক বা শস্যগোলা ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন গ্রামে শিক্ষিত পুরুষ ও ব্যবসায় পরিচালনার দক্ষ লোক। এই দুটি অভাব থাকায় শস্যগোলা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হওয়া কঠিন (মেক্যালপিন ৬০)।

কৃষকরা সাধারণত সেচবিহীন জমির জন্য ১৫০ টাকা এবং সেচযুক্ত জমির জন্য ২০০ টাকা আগাম ঋণ পেতো সমবায় সমিতির মাধ্যমে। ঋণগ্রহীতা সদস্য হয়ে প্রয়োজনীয় শেয়ার কিনতেন এবং ঋণে কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না। উচ্চ ফলনশীল ধানের জন্য একর প্রতি ঋণ ২৯০ টাকা পর্যন্ত দিত, যার মধ্যে ১৪০ টাকা সার নিতে হত বাকি টাকা নগদ পাওয়া যেত। জেলার বেশির ভাগ সমিতি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের সাথে যুক্ত ছিল। স্বল্প-মেয়াদী ঋণে ৮০% নগদ প্রদান ও ২০% মার্কেটিং সমিতি থেকে নেওয়া হত। সাম্প্রতিক বছরে জেলা কার্যনির্বাহী সমবায় কর্তৃক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক থেকে স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ঋণ গৃহীত হয়েছে (মজুমদার ২০৯)।

উপসংহার : ঔপনিবেশিক আমলে বীরভূম জেলার কৃষিব্যবস্থায় ঐতিহ্যবাহী প্রথা ও আধুনিক উদ্যোগের এক অসাধারণ মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৫ সালের পূর্ববর্তী সময়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিণতিতে শহুরে ধনী ব্যবসায়ীদের নতুন জমিদার শ্রেণী হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে, যারা কৃষকদের উপর অতিরিক্ত খাজনা, নজরানা ও বিভিন্ন নামে অর্থ সংগ্রহের চাপ সৃষ্টি করে। পত্তনী ব্যবস্থার মাধ্যমে একাধিক স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী কৃষকের উপর অসহনীয় অর্থনৈতিক শোষণ চালায় এবং উচ্চসুদে মহাজনী ঋণের জালে কৃষক সম্প্রদায়কে স্থায়ীভাবে বন্দী করে রাখে।

অজয় ও ময়ূরাক্ষী নদীর নিয়মিত বন্যা কৃষিজমিকে বালুময় করে অকেজো করে ফেলে এবং নিরন্তর খরার কারণে চাষযোগ্য জমির বিপুল পরিমাণ পতিত অবস্থায় থাকে। কাঁদর খালগুলো পলি ও বালিতে পূর্ণ হয়ে সেচ ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেয়। পশ্চিমাঞ্চলের পাথুরে ও জঙ্গলবেষ্টিত ভূখণ্ড চাষাবাদের জন্য প্রায় অনুপযুক্ত ছিল, যদিও পূর্বাঞ্চলের নিম্নভূমি তুলনামূলকভাবে উর্বর ছিল। উনিশ শতকে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি ও বাজার সম্প্রসারণের সুবিধা সত্ত্বেও শস্য ও টাকা ভিত্তিক দ্বৈত খাজনা ব্যবস্থা এবং জমিদারি সম্পত্তির অবিশ্রান্ত বিভাজন কৃষকদের কাছে কোনো স্বস্তি প্রদান করেনি।

শান্তিনিকেতন কৃষি বিভাগের লেওনার্ড এলমহার্স্টের নেতৃত্বাধীন কার্যক্রম নতুন জাতের ফসল চাষ, হাঁড়ি আখ চাষের উদ্ভাবনী পদ্ধতি, মুলতানি-হরিয়ানা মিশ্রগরুর উন্নয়ন এবং রবীন্দ্রনাথের সমবায় নীতির ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে কৃষক সমাজকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলে। ১৯০৪ সালের কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি আইনের বাস্তবায়ন স্বল্প সুদে ঋণের সুবিধা প্রদান করে মহাজনী শোষণের চক্র ভেঙে দেয় এবং ১৯২৬-২৭ সালে ১৩,৩৩৬টি সমিতি ৩২ লাখ টাকা মূলধন নিয়ে কৃষকক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। ময়ূরাক্ষী নদী প্রকল্পের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ জমি সেচযোগ্য হয়েছে এবং পুকুর খনন ও সংস্কার স্থানীয় পর্যায়ে জলসঞ্চয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। সিউড়ির ক্যাটেল অ্যান্ড প্রোডাক্ট শো এবং বিদেশি ষাঁড়ের আমদানি গবাদি পশুর গুণগত মান ও উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে।

ঔপনিবেশিক আমলের কঠোর চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে বীরভূমের কৃষি ব্যবস্থা ধীরে ধীরে আধুনিকায়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। সামাজিক শোষণের জাল, অতিরিক্ত করের চাপ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কঠিন বাধার মধ্যেও শান্তিনিকেতনের পল্লীসংগঠন, গাঁতোপ্রথা এবং সমবায় আন্দোলনের মতো স্থানীয় উদ্যোগ বাংলার কৃষি ইতিহাসে এক অনন্য ও প্রেরণাদায়ক অধ্যায় রচনা করেছে। এই জটিলতা, সংঘাত এবং রূপান্তরের গতিপথই বীরভূমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের মূল চেতনাকে প্রকাশ করে।

Reference:

১. দত্ত, অচিন্ত্য কুমার, ইকোনমি এ্যান্ড ইকোলজি ইন এ বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট: বার্ডওয়ান ১৮৮০-১৯৪৭, কোলকাতা, ২০০২, পৃ. ১

২. গ্যাডগিল, ডি. আর. দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভোল্যুশন অব ইন্ডিয়া ইন মডার্ন টাইমস, লন্ডন, ১৯৩৩, পৃ. ৬৬

৩. গ্যাডগিল, ডি. আর. ঐ, পৃপৃ. ৬৬-৬৭

৪. গুপ্ত, রঞ্জন কুমার, দ্য ইকোনমিক লাইফ অব এ বেঙ্গল ডিসট্রিক্ট: বীরভূম, ১৭৭০-১৮৫৭, বার্ডওয়ান, ১৯৮৪, পৃপৃ. ৯-১১

৫. গুপ্ত, রঞ্জন কুমার, ঐ, পৃ. ১১৪

৬. গুপ্ত, রঞ্জন, রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ, কলিকাতা, ২০০১, পৃপৃ. ১৬৩-১৬৪

৭. গুপ্ত, রঞ্জন, ঐ, পৃ. ১৬৪

৮. গুপ্ত, রঞ্জন কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৯. উইলিয়াম, উইলককস, লেকচারস অন দ্য এ্যানসিয়েন্ট সিস্টেম অব ইরিগেশন ইন বেঙ্গল এ্যান্ড ইটস এ্যাপ্লিকেশন টু মডার্ন প্রবলেমস, কোলকাতা, ১৯৩০, পৃপৃ, ৭-৮

১০. গুপ্ত, রঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

১১. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, ১৯০০-১৯৪৭, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১৪

১২. চৌধুরী, বিনয়, দ্য কেমব্রিজ ইকোনমিক হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া; ভলিউম-২, দিল্লী, ১৯৮৪, পৃ. ১১৫

১৩. গুপ্ত, রঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

১৪. গুপ্ত, রঞ্জন কুমার, প্রাগুক্ত, পৃপৃ. ১২৩-১২৪

১৫. দত্ত, অচিন্ত্য কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৬. দত্ত, অচিন্ত্য কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

১৭. গুপ্ত, রঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃপৃ. ৭৬-১১৩

১৮. বাগচী, শ্রীশশাঙ্কশেখর ও মুখোপাধ্যায়, শ্রী সুধাংসুভূষণ, অর্থনৈতিক-সমাজ-রাষ্ট্র, কোলকাতা, ১৯৪৭, পৃ. ২২০

১৯. ও ম্যালি, এল. এস. এস. বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারস, বীরভূম, দ্য বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপো, ক্যালকাটা, ১৯১০, পৃ. ৫৪

২০. গুপ্ত, রঞ্জন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

২১. মুখার্জী, বি. বি. ফাইনাল রিপোর্ট অন দ্য সার্ভে এ্যান্ড সেটেলমেন্ট অপারেশনস ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব বীরভূম ১৯২৪-১৯৩২, ক্যালকাটা, ১৯৩২

২২. মিত্র, অশোক, সেনসাস রিপোর্ট ১৯৫১; বীরভূম ডিস্ট্রিক্ট গভর্নমেন্ট অব ওয়েস্ট বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯৫৪, পৃ. xvi

২৩. ও ম্যালি, এল. এস. এস. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

২৪. মিত্র, গৌরীহর, বীরভূমের ইতিহাস, অরুণ চৌধুরী (সম্পাদক), সিউড়ী, ২০০০, পৃ. ৪২৯

২৫. মিত্র, গৌরীহর, ঐ, পৃপৃ. ৪২৭-৪২৮

২৬. মিত্র, গৌরীহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৬

২৭. বাগচী, শ্রীশশাঙ্কশেখর ও মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংসুভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃপৃ. ২২০-২২১

২৮. চক্রবর্তী, পি. সি. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১ ও দুর্গাদাস মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

২৯. মজুমদার, দুর্গাদাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৩০. হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭০

৩১. চক্রবর্তী, পি. সি. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪

৩২. মিত্র, অশোক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

৩৩. বাগচী, শ্রীশশাঙ্কশেখর, ও মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংসুভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৩৪. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, উনবিংশ শতাব্দী, ১৯৮৭, কলকাতা, পৃপৃ. ৫৩-৫৫

৩৫. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, ঐ, পৃ. ৫৫

৩৬. চৌধুরী, কে. সি. দ্য হিস্ট্রি এ্যান্ড ইকোনোমিক্স অব দ্য ল্যান্ড সিস্টেম ইন বেঙ্গল, ক্যালকাটা, ১৯২৭, পৃ. ৬

৩৭. সাহা, কে. বি. প্রাগুক্ত, পৃপৃ. ৯৭-৯৮

৩৮. সান্যাল, প্রমথনাথ, ও গুহ, সুরেশ চন্দ্র, পল্লীশ্রী পত্রিকা, জৈষ্ঠ্য, প্রথম সংখ্যা, ১৯২৯, পৃ. ৪৯

৩৯. মুখার্জী, বি. বি. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

৪০. চ্যাটার্জী, পার্থ, বেঙ্গল, ১৯২০-১৯৪৭, দ্য ল্যান্ড কোয়েশ্চেন, ক্যালকাটা, ১৯৫৯, পৃ. ১৯

৪১. মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪২. স্বর্ণকার, নগেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, ২য় খন্ড, তৃতীয় সংখ্যা, পৃ. ৫৯ ও প্রথম সংখ্যা, পৃ. ৩

৪৩. মুখোপাধ্যায়, নীলরতন, বীরভূমি পত্রিকা, প্রথমভাগ, অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০২ ও দুর্গাদাস মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৪৪. মুখোপাধ্যায়, নীলরতন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

৪৫. স্বর্ণকার, নগেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

৪৬. মজুমদার, দুর্গাদাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

৪৭. স্বর্ণকার, নগেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৪৮. লাহিড়ী, কিরণ. সি. রুরাল বেঙ্গল, হাউ টু রিভাইভ, ক্যালকাটা, ১৯৩৮, পৃপৃ. ১৬৬-১৭৬

৪৯. স্বর্ণকার, নগেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৫০. ভট্টাচার্য, শ্রী হেরম্বচন্দ্র, ভারতবর্ষের ইতিহাস, শ্রীরামপুর, ১৯৫১, পৃ. ৩১৫

৫১. সিংহ, দীক্ষিত, রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, প্রবন্ধ, কলকাতা, ২০০০, পৃপৃ. ৪২৪-৪৩২

৫২. সিংহ, দীক্ষিত, ঐ, পৃ. ৪২৭

৫৩. ভট্টাচার্য, শ্রী হেরম্বচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

৫৪. অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন দ্যা ওয়ার্কিং অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিস ইন বেঙ্গল ১৯২৬-১৯২৭, পৃপৃ. ৫২-৫৩।

৫৫. স্বর্ণকার, নগেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৫৬. মেক্যালপিন, এম. সি. রিপোর্ট অন দ্য কন্ডিশন অব দ্যা সনথালস ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এ্যান্ড নর্থবালাসোর, ক্যালকাটা, ১৯০৯, পৃ. ৬০

৫৭. মজুমদার, দুর্গাদাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯